OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 78 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 78 - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সুলেখা সান্যালের ছোটগল্প : নারী পরিসরের নানা মাত্রা

সোমা রায় চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপিকা, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস কলেজ
Email ID: sraychaudhuri66@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Women and post WWII Bengal, Patriarchy; Partition; Refugee trauma; Feminist perspective; Women and role transition.

Abstract
This article examines Sulekha Sanyal's short stories, focusing on women's experiences in mid-twentieth-century Bengal. Situating her work within colonial transformation, famine, Partition, and refugee rehabilitation, the study shows how Sanyal foregrounds the everyday realities of marginalised women. Although she wrote before feminist discourse was formally articulated in Indian literature, her stories engage with themes central to feminism, especially the intersection of personal and political concerns of women. Sanyal's narratives depict women confronting patriarchy, poverty, displacement, and social stigma while seeking to assert agency and dignity. The article analyses stories of Sanyal addressing refugee trauma, sexual exploitation, precarious labour, and maternal challenges. It illustrates how she transforms individual suffering into broader social critique, like the present-day feminist writers. Unlike earlier male-authored works, her female characters are rooted in the lived experience of everyday drudgeries and as the witnesses of the historical episodes, and embody resistance, self-awareness, and evolving identities. The study also traces the transition of women's roles from domestic confinement to economic participation and intellectual development, reflecting broader societal changes. Ultimately, Sanyal's work is interpreted in this article as an effort to rewrite history from a female perspective, transforming 'his-story' into 'her-story' and establishing her as a significant, though systematically overlooked, figure in Bengali literature.

Discussion

বিশশতকের কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী কথাকারদের মধ্যে সুলেখা সান্যাল অন্যতম একটি নাম। তিরিশ-চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে উপনিবেশিক শাসন-শোষণ অবসানের প্রাকলগ্নে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে আলোরিত বাংলায় সুলেখার রাজনীতি ও সাহিত্য জীবনে পদার্পন ও স্থিতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগের অনিবার্য ফলস্বরূপ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা জর্জরিত বাংলায় সমাজ পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন সাম্যবাদে বিশ্বাসী যেসব মানুষ তাঁদের মধ্যে সুলেখাও ছিলেন। জন্মস্থান কোঁড়কদি থেকে শিক্ষার্থী হিসেবে কলকাতায় এসে বামপন্থী আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করে করে নেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর জীবনবীক্ষারই অংশ। মার্ক্সবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 78 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ধারায় 'পরিচয়', 'অরণি', 'পূর্বাসা', 'নতুন সাহিত্য', 'অগ্রণী', 'চতুষ্কোণ' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখোপাধ্যায়, ছবি বসু, মনিকুন্তলা সেন, কনক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের সাথে সুলেখা সান্যালেরও লেখালেখির পরিচয় মেলে। তিনি ছিলেন 'পরিচয়', 'অরণি', 'নতুন সাহিত্য' 'অগ্রণী' পত্রিকায় নিয়মিত লেখক। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁর লেখালেখির সাথে সমকাল পরিচিত হলেও পরবর্তী দশকগুলিতে এই লেখাগুলি বহুপঠিত না হওয়ায় তা লোক-চক্ষুর আড়ালেই চলে যায়। এর কারণ হয়তো সুলেখার অকালপ্রয়াণ (১৯২৮-১৯৬২ খ্রি.)। গবেষক মহলে 'সুলেখা সান্যাল' নামটি চর্চার বিষয় হতে শুরু করলে পুনরায় তাঁর লেখালেখি নিয়ে পর্যালোচনার পরিসর তৈরি হয়। তাঁর লেখা যে একসময় যথেষ্ট সমাদৃত ছিল তার প্রমাণ ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর বক্তব্যে সুলেখার 'দেওয়াল পদ্ম' উপন্যাসটির নাম উচ্চারণ।[১] এই স্বল্প জীবন পরিসরে তিনি তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্প লেখার জন্য যেধরণের বিষয়কে বেছে নিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার মুল্য কম নয়। অনুজা সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়ের) কথায়, —

> "যে আত্মপ্রত্যয়ী, বিদ্রোহী, আপসহীন মন নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল তাঁর প্রতিকূল পরিবেশ, তাঁর ব্যক্তিজীবন। ...জীবনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই তাঁর যাত্রাপথ—তিনি একাকিনী, সাহসিকা, বিদ্রোহিনী। তাঁর অনেক কাহিনীর কেন্দ্রেই আছেন তিনি স্বয়ং। একালের সচেতন নারী তাঁকে অনুভব করে 'ফেমিনিষ্ট' লেখিকা হিসেবে গণ্য করতে চান তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই।"[২]

সুলেখা সান্যাল যে সময়পর্বে লেখালেখির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সে সময় 'নারীবাদ' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়নি সেভাবে। তবে নারী পুরুষের সামাজিক অবস্থানগত অসাম্য, বৈষম্য, নিপীড়ন বহু আগে থেকেই ফল্গু ধারায় সমাজের মধ্যে বইছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জীবনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের সুকৌশলে বঞ্চিত করে চলেছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। শিক্ষার আলো মেয়েদের উনিশশতক থেকেই নিজেদের বঞ্চনা ও শোষণকে চিনতে শেখাচ্ছিল। কিন্তু সামাজিক নানা জোরের কাছে তাদের অনুভব উচ্চকিত হবার সুযোগ পায়নি। এই শোষণ বা বঞ্চনা যে কোনও একজন নারীর একক অনুভব তা তো নয়, বরং এই অভিজ্ঞতা সকলেরই shared experience। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় ব্যক্তিপরিসর আর রাজনৈতিক পরিসর মধ্যে যে বিভেদরেখা টানা হয় তাকে নিয়েই নারীবাদে প্রশ্ন ওঠে। কারণ ব্যক্তিপরিসর আর গণপরিসর কেউই আত্ম-নির্ভর নয়, বরং একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ব্যক্তিপরিসরকে যেমন রাষ্ট্র নানাভাবে প্রভাবিত করে, তেমনি পরিবারের মধ্যে থাকা মানুষজন রাষ্ট্রনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পরিবারের মধ্যে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, এমনকি যৌন সম্পর্কের মধ্যেও রাজনৈতিক সমীকরণ থাকে। পরিবারে কে কিভাবে কাজ করবে, কি সিদ্ধান্ত নেবে তার মধ্যে ক্ষমতার সমীকরণ থাকে। ৬০-৭০ এর দশকের যে নারী-মুক্তি আন্দোলন হয়েছিল তাতে অংশগ্রহণকারী সকলেই অনুভব করেছিলেন যে ব্যক্তিগত বলে যা মনে হয় তার সবটাই সমাজ-রাজনীতির অংশ— The personal is political. তাই মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার লাভ করা দরকার। সুলেখা কোনদিনই এই পিতৃতান্ত্রিক ভ্রুকুটি দ্বারা আবিষ্ট হননি, বরং নিজ অনুভবকে সম্বল করে নিজের লিখন-বিশ্ব নিজেই নির্মান করেছেন। রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম নেওয়া একটি গ্রাম্য মেয়ে বারংবার নানা বিধিনিষেধের মুখোমুখি হয়ে মেয়েজীবনের নানা ঊণতাগুলিকে খুব সামনে থেকে দেখেছে। প্রেম, সংসার তাঁকে বারবার ফাঁকি দিয়েছে। মেয়েদের যে নানারকম বাধার গণ্ডি পেরিয়ে প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হয় বা অনেক সময়ে ব্যর্থও হতে হয় তা তিনি নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন কিন্তু সেখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। বরং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সেই বাধার কাছে আত্ম-সমর্পন না করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন।

সুলেখার ছোটগল্পের সংখ্যা সাঁইত্রিশ। এই গল্পগুলির মধ্যে কিছু গল্পে দাঙ্গা, দেশভাগ যুদ্ধের আবহে কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে যার মধ্যে লেখিকার সমাজমনস্কতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, আবার ব্যক্তিগত জীবনের শুন্যতাবোধের বা nothingness এর প্রকাশ রয়েছে বেশ কিছু গল্পে। গল্পগুলির বেশিরভাগেরই কেন্দ্রে রয়েছে মেয়েরা। তথাকথিত নারীবাদী ছাপ গায়ে না মেখেও তিনি মেয়েদের একান্ত নিজস্ব যন্ত্রণা, অন্তর্দহনকে চিহ্নিত করেছেন অসামান্য দক্ষতায়। তাঁর কিছু আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নারী চরিত্র সৃজনে আমরা রাজনৈতিকবোধে উন্নীত প্রতিবাদী নারী চরিত্র পেয়েছি, বা লেখায় সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করেছি। তবে তা ছিল পুরুষের দৃষ্টিতে নারীপ্রতিমার চিত্রণ। সুলেখা সান্যাল একেবারে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 78 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিজস্ব জীবনঅভিজ্ঞতাকে ছেনে তাঁর নারীচরিত্রগুলিকে এমনভাবে নানা রূপে নানা মাত্রায় উপস্থাপিত করলেন যে তারা তাদের জীবনের সংকট, সংগ্রাম ও প্রতিবাদকে নিজের মতো করে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল। পুরুষতন্ত্রের আবেষ্টনীর অন্তরালে থাকা মেয়েরা অচলায়তনকে ভাঙার দাবীতে প্রশ্ন করতে শুরু করল। এই বিনির্মান নতুন ভাবে ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে জরুরী। যে ইতিহাস এতদিন পুরুষের আধিপত্য ও ক্ষমতার জয়গান গেয়েছে কিন্তু তার পিছনে থাকা নারীর বঞ্চনা ও কান্নার কাহিনীগুলোকে একেবারে উপেক্ষা করে গিয়েছে তার তো বদল প্রয়োজন। তাই ইউরোপীয় নারীবাদের সাথে পরিচিত না হয়েও তাঁর লেখার সাথে অনেক সময়ই বোভেয়ারের বলা কথাগুলি মিলে যায়। সুলেখার লেখা হয়ত সেই জন্যই 'His'-tory-কে 'Her'-story-তে রূপ দেবার একটা প্রয়াস হিসেবে পাঠকের কাছে প্রতীয়মান হয়।

তিনি যে সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেটি ভারতবর্ষের বুকে এক উত্তাল সময়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গার ঝড় সামলাতে সামলাতে ভারত যেমন স্বাধীন হল, তেমনই তার সাথে দেশভাগ আর ছিন্নমূল মানুষের সমস্যার অনিবার্য প্রাপ্তি ঘটল। সময় সচেতন লেখক কখনই দেশকাল নিরপেক্ষ হতে পারেন না। সুলেখাও হননি। যুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক মন্দা, কালোবাজারি, সংসার প্রতিপালনে মেয়েদের বাইরের কাজে যুক্ত হওয়া যেমন তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে, তেমনই এসেছে সর্বস্ব খুইয়ে এপারে আসা মানুষজনের চাপা যন্ত্রণা, স্মৃতিমেদুরতা, একেবারে অজানা এবং সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় এসে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই — সে লড়াই একদিকে যেমন এপারের মানুষের বিদ্রূপ উপহাসের সঙ্গে, অন্যদিকে তাদের জীবন-জীবিকার মৌলিক অধিকারটুকু রক্ষার তাগিদে অনেকসময় রাষ্ট্রের সঙ্গেও। 'ঘেন্না' গল্পে দেশভাগের ফলে ওপার বাংলার ছিন্নমূল বিধবা সৌদামিনীকে এপারে এসে চাল চোরাচালানের সাথে যুক্ত হতে হয়। এ লাইনে নতুন বলে সে খুব একটা সড়গড় হতে না পারায় তাকে সবাই 'বাঙাল' বলে খেপায়। এত অপমান সহ্য করেও সে যে দেশ থেকে বিতারিত হয়েছে সেই চরম সত্যিটা স্বীকার করতে চায় না। বলে, -

"তাড়াবি কেন। ওরাও থাকতেই কইছিল। সকলে আসতিছে দেখে আমি আর থাকি কোন ভরসায়।"[৩]

পিছুটানের এই কষ্ট এবং অসহায়তা এদেশের মানুষের বোধগম্য হবার নয়। রাতে শুয়ে সৌদামিনীর মনে পড়ে ফসলের দখল নিতে গিয়ে প্রাণ যাওয়া স্বামী কার্তিকের কথা, প্রতিবেশিদের কথা ভেবে চোখ জলে ভরে আসে। নিজেকে এ দেশের সাথে একাত্ম করতে পারে না সে "দ্যাশ কই? এ-কনে আলাম আমি। ...বাঙালের কান্না।"[৪] একই অনুভূতি 'বাস্তুভিটা'র কাত্যায়নীরও। বড়োছেলে উমাপতি এ দেশের পুনর্বাসনে সুবিধার আশায় তাকে যতই বোঝাতে চেষ্টা করে নিজেকে 'আশ্রয়প্রার্থী' হিসেবে পরিচয় দিতে কাতায়্যনী তাতে কিছুতেই রাজী হতে পারেন না। বাড়ির দুর্গামণ্ডপ ভেঙ্গে পড়ার স্বপ্ন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় ঐ দেশে—

> "দেশের কথা মনে পড়ে চোখ জলে ভরে এল। এখন নেমেছে...সামনের মাঠের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন কাত্যায়নী... কী অদ্ভুত রুক্ষ দেশ—কোথাও এতটুকু শ্যামলতা নেই... কিছু ভালো লাগছে না কাত্যায়নীর। কীসের এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকের মধ্যে জ্বলে যাচ্ছে।"[৫]

দেশভাগ যে কত মানুষকে নিজের শিকড় থেকে বলপূর্বক আলাদা করে দিয়েছিল তাদের অব্যক্ত যন্ত্রণাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন সুলেখা। সৌদামিনী এবং কাত্যায়নী সেই মানবিক ও মানসিক অবক্ষয়ের প্রতীক মাত্র।

যুদ্ধ যে শুধু রাষ্ট্রনায়কদের জয়-পরাজয়ে সীমায়িত থাকে তা নয়, তার প্রভাব-বলয় অনেক কিছুকে অবলীলায় গ্রাস করে ফেলে। অর্থনীতি, সামাজিক বিপর্যয় ছাড়াও সংসারের চৌহদ্দিতেও থাকা মানুষজনও এই সংকট-জাল ছিন্ন করতে পারে না। এই সংকট শুধু তো পুরুষের নয়। সুলেখা সান্যালের 'পঙ্কতিলক' গল্পে মেয়েরাও কিভাবে ধীরে ধীরে এই যুদ্ধোত্তর সমাজ ব্যবস্থার শিকার হয়ে পড়ছিল তার মর্মস্পর্শী চিত্রন রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর তেতাল্লিশের মন্বন্তরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে গ্রামের কৃষিজীবী মেয়ে বউদেরও 'ওয়ার্কহাউস'-এ কাজে যোগ দিতে হয়েছিল। সারাদিন তারা ধান ভানত, গম পিষত, ছেলে পেটাত আর ভাত কম হলে ঝগড়া করত। গ্রামের কমবয়সী, মিতভাষী, সুন্দরী, বিধবা শৈলবালা এই ওয়ার্কহাউসে যোগ দিলে সেখানকার কর্মচারী অবনীবাবুর দৃষ্টি পড়ে তার উপর। সমাজের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী অন্য মেয়েরা এর জন্য তাকেই দায়ী করে দিবারাত্র গঞ্জনা দিত। অর্থাভাবে কিছুদিন তাকে যে শরীর বেচে স্বামীর অসুস্থতাকে সামাল দিতে হয়েছিল আর এই কারণেই তার একমাত্র কন্যাকে জোরপূর্বক তার থেকে বিচ্যুত করা হয়েছিল, প্রতিবেশী

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 78 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হিসেবে হয়তো তারা এ কথা জানত। এদের হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় শৈলশহরে গিয়ে দেহ ব্যবসার সাথেই আবার যুক্ত হয়ে পড়ে। যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য আর শ্রী হারানো শৈল মেয়েকে একটিবার দেখার আশায় গ্রামে ফেরে এবং আত্মীয় দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। শেষপর্যন্ত আত্মহনন তার এই অগৌরবময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এটা সেসময়ের শুধু একজন শৈলবালার কাহিনী নয়। গল্পকথক অলকার জবানীতে লেখিকার অনুভব—

> "...সত্যিই শৈল বেঁচেছে।... শৈলর মৃত্যুর জন্য কারা দায়ী? ওয়ার্কহাউসের মেয়েদের গঞ্জনা, গ্রামের লোকের উৎপাত, না অবনীবাবু? অলকার চোখের সামনে ফুটে ওঠে আরো কত শত শৈলবালার ছবি—যারা এমনি করেই প্রাণ দিচ্ছে, কে তাদের খবর রাখে?"[৬]

সমসাময়িক সমাজ পরিস্থিতিতে সংকটাপন্ন মানুষের অসহায় অবস্থার জন্য একদিকে যেমন প্রাকৃতিক কিছু কারণ ছিল তার থেকেও বেশি ছিল অবস্থাকে সামাল দিতে প্রশাসনিক ব্যর্থতা। বন্যা ও পোকামাকড়ের উৎপাতে '৪২ সালে ধান উৎপাদন অনেক কম হয়েছিল তার উপর কালোবাজারিতে একশ্রেণির মানুষ খাদ্যশস্য মজুদ করতে শুরু করে। ফলে চালের দাম অসম্ভব বেড়ে যাওয়ায় খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৪৩ সালের বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এক ভয়াবহ মন্বন্তরে দলে দলে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে। এই গ্রাম শহরের অভিবাসন কালে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। তাদের মধ্যে অনেক মহিলা ও শিশুও ছিল। 'মরুমায়া'র সরলা সেই মন্বন্তরের শিকার এমন এক মা, যাকে তার মজুতদার প্রতিবেশি বিজয় দাসের রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা সুগন্ধের বিপ্রতীপে সন্তানের পাতে শুধু ফেনভাত আর শাকভাজাটুকুই তুলে দিতে গিয়ে আত্মগ্লানিতে ভুগতে হয়। খিদের জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠলে অন্নের সন্ধানে সপরিবার শহরে চলে আসে। মহামারী আক্রান্ত শহরেও চারিধারে মৃতদেহের সারি আর খাবারের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি - মারামারি। গ্রামের সম্পন্ন কৃষক পরিবারের বধূ সরলার মেয়েকে নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। সুযোগসন্ধানী মানুষের লালসার থাবা এড়িয়ে মানুষের বাড়িতে 'চাকরানি' হিসেবে ঠাঁই হয় তার। তারই সঙ্গে গ্রাম থেকে আসা মেয়েদের পরিণতি হিসেবে সে দেখে অনাহারে মৃত্যু, অথবা যৌনব্যবসার শরিক হওয়াকে। সরলা এই ভেবে আস্বস্ত হয় যে এই দুর্ভিক্ষের বাজারে সে অন্তত এমন পরিণতির শিকার হয়নি। যুদ্ধ কিভাবে গৃহস্থ বউ-মেয়ের অস্তিত্বের সংকট বয়ে এনে তার আত্মমর্যাদাকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে পারে কমিউনিজমে বিশ্বাসী সুলেখা সান্যাল এই গল্পে তার মর্মবিদারক বর্ণনা করেছেন—

> "প্রথমে খুবই কষ্ট হত সরলার— আত্মসম্মানে কেমন যেন ঘা লাগত তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে সরলা। আর তো ফিরতে হবে না দুঃস্থদের দলে। সেই দীর্ঘ রাস্তা। ...ঠোঁটে গালে রং মাখা, দামী শাড়ি-পড়া হরিদাসীকে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ছিল সরলা। কিরকম নির্লজ্জ, অদ্ভুত একটা দৃষ্টি ওর চোখে।... এরকম দৃষ্টি তো কোনোদিন ছিল না হরিদাসীর চোখে। এমন নির্লজ্জ বেহায়াপানা— অশ্লীল হরিদাসীর ওপর সহানুভূতিতে ভরে উঠে ছিল তার বুক। পরক্ষণেই মনে পড়েছিল সেই লোকটার ঘৃণ্য প্রস্তাবের কথা—তার যদি আজ এ দশা হত। সমস্ত শরীর শিউরে উঠতেই দু-হাত দিয়ে অমলাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল সরলা।"[৭]

সুলেখা সান্যালের লেখায় সময় কথা বলে। সময়ের চালচিত্রে মেয়েদের অসহায় অবস্থা, লড়াই, ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে হারিয়ে ফেলা, মূল্যবোধের অপচয় এ সবই খুব কাছ থেকে দেখা অভিজ্ঞতা লেখিকার। তাঁর গল্পে অসংখ্য নারীর ভিড়ে কিছু 'মা'-ও রয়েছে যাদের মাতৃত্ব দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষ। এইসব মায়েরা সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য চোরাচালান থেকে ভিক্ষুক জীবনকে বরণ করে নিতেও পিছপা হয় না। আর আছে সন্তানের সব ভুলকে, অপারগতাকে ক্ষমা করে আবার তারই আশ্রয় হয়ে ওঠা মা। 'দায়' গল্পে সেই মায়ের ছবিও রয়েছে যে এই খাদ্য সংকটের দিনে সন্তানদের ইচ্ছাকৃতভাবেই একটু রাত করেই খাওয়ায়, কারণ রাত বাড়লেই তারা ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ ঘুমন্ত সন্তানকে ভাত খাওয়ানোর বাধ্যবাধকতা থাকে না। মুখে যা দেওয়া যায় টপ করে গিলে ফেলে। ছেলেমেয়েদের বাবা চোরাচালানের চাল না কেনার পণ করায় কষ্টের দিনে সন্তানকে শেখাতে হয় বেশি ভাত খাওয়া খারাপ, খিদে পেলে রাঙাআলু সেদ্ধ করে খাওয়া যেতে পারে। মা মনে মনে বলে, 'রুটি খেতে শিখে নে তোরা, ভাত খাবার দিন যে এটা নয়।' ৪৩-এর মন্বন্তরকালীন এ মর্মান্তিক দৃশ্য ঘরে ঘরে লক্ষ্য করা যেত। সেই সময় সমাজের একশ্রেণির মানুষ গরীব মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বড়লোক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 78 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয় আর গরীব মানুষ দারিদ্রের আরও তলানীতে পৌঁছে যেতে থাকে। সাম্যবাদে বিশ্বাসী সুলেখা একজন সচেতন লেখক হিসেবে এভাবেই personal আর political কে এক সুতোয় বেঁধে ফেলেন। তাই কারান্তরালে থাকা মেয়েদের ঘর হারানো, সন্তান হারানোর ব্যথার সাথে অনায়াসেই একাকার হয়ে যায় তেভাগার কৃষক আন্দোলন, রাষ্ট্রিক সন্ত্রাস, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা। 'জন্মাষ্টমী' গল্পে রিফুউজি উষাকে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে জেলে চালান করে দেওয়া হয়েছে। সন্তানকে হাসপাতালে রেখেই তাকে চলে আসতে হয়েছে। সন্তানের কোনও খবর না পাওয়ায় পাগলের মতো করে সে। কিন্তু কেউ তার এই আচরণের মর্মার্থ বোঝার চেষ্টামাত্র করে না, তাকে পাগল বলে দাগিয়ে দেয়। উষা নিজেও বুজতে পারে না যে তার অপরাধটা কী—

> "...তারপরেই হঠাৎ মাথা ঠুকতে শুরু করে লোহার গরাদে, দ্যাশ কই আমার, ঘর কই? ছাওয়াল কই আমার? ক্যান ধরল আমারে?"[৮]

কারাগারে অপর কয়েদী মেনকার সন্তান জন্মের খবরে সকল মায়েরাই যেন আপন সন্তানের বিয়োগ যন্ত্রণাকে ভোলার চেষ্টা করে। "আইছে! সোনাডা আমার।"[৯] এই অনুভূতিটুকু শুধু উষার নয়, বরং কারাভ্যন্তরের সকল মায়ের। এই শিশুটির উপর তাদের সকলেরই অধিকার স্থাপিত হয়। একটি শিশুর আগমনে তারা সকলেই যেন এক একজন যশোদা মা হয়ে ওঠে।

তবে সুলেখার কাছে মাতৃত্ব বহমান জীবনের একটা পর্যায় মাত্র, সেটিই প্রধান নয়। তিনি তাঁর রচনায় সেই সব মেয়েদেরকেও সৃষ্টি করেছেন যারা শিক্ষিত স্বনির্ভর। তবে এরা কেউই পুরুষ বিদ্বেষী নয়, পুরুষ নির্ভরও নয় বরং তাদের সাথে বা পাশে নিয়েই চলাতেই বিশ্বাসী। তবে বিশ্বাস ভঙ্গে সেই পুরুষকে প্রত্যাখ্যানের মানসিক দৃঢ়তাও আছে এইসব নারীদের। ব্যক্তিগত জীবনে যে আদর্শকে নিয়ে তিনি পথ চলেছেন, তাঁর গল্পে-উপন্যাসের নারী চরিত্ররা সে আদর্শ মেনেই জীবনের পথ অতিক্রম করেছে। 'সুলেখা সান্যালের গল্পের ভুবন' প্রবন্ধে তুষার পন্ডিত সুলেখার নারীদের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে —

> "যাবতীয় অপচয় ও শূন্যতার ভিতর থেকেও এরা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় উজ্জীবনের মন্ত্র। ফর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝোঁক তাঁর গল্পে তেমন নেই, মানুষের জটিল কুটৈষণার পথেও হাঁটেননি লেখিকা। আসলে আপাত-সরল কাহিনীর কিনার ঘেঁষে কেবল স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের আলোছায়া। এই মধ্য বা নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীরা আত্মমর্যাদাবান, পারিবারিক দায়িত্ববোধে সৎ। প্রতিকূল অর্থনৈতিক চাপের মুখেও গতিময় রাখে জীবনের স্বাভাবিক বেগটিকে।"[১০]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো মেয়েদের শেখায় অপরের জন্য বাঁচাতেই জীবনের সার্থকতা। বিশ শতকের প্রথমার্ধের মেয়েরাও সেভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। মেয়েরা যে সামাজিক নির্মানের অংশ হয়েই 'মেয়েলী' ভূমিকা পালন করে চলে এবং সেই পরিসরে তাদের আবদ্ধ রাখতেই যে তাদের নানা দিক থেকে মহিমান্বিত করা হয়, মেয়েরাও অনেকসময়ই সেই সুক্ষ ফাঁকটুকু চিনে উঠতে পারেনা। নিজের অজান্তেই মনের ইচ্ছে ভালোলাগাগুলো শুধু হারিয়ে যেতে থাকে। পিতৃতন্ত্র মানে যে শুধু পুরুষ নিয়ন্ত্রণ তা তো নয়, এর শিকড় আরো বিস্তৃত, আরো গভীর। ছোটবেলা থেকে একটি মেয়ে যতরকম 'না'- এর মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়, ছেলেদের তা হতে হয় না। বিশশতকে মেয়েদের বেড়ে ওঠা ছিল বিবাহের প্রস্তুতি। সিমোন দ্য বোভেয়ারের মতে— বিয়ে হচ্ছে নারীর সেই নিয়তি যা সমাজ ঐতিহ্যগতভাবে তাকে দান করেছে।[১১] পিতৃতান্ত্রিকতার কাছে 'নারী-স্বাধীনতা' শব্দটি তাচ্ছিল্যসূচক। তাই সুলেখা নারী চৈতন্যের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন বিমলা চরিত্রের আশ্রয়ে। 'সংঘাত' গল্পে ছয় সন্তানের জননী বিমলা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ফরমাস খেটে স্বামী ও তার পরিবারের সকলকে সন্তুষ্ট করে রাখে। সংসারের কোনো ব্যাপারে কথা বলার অধিকার নেই তার, এমনকি সন্তানকে শাসনের অধিকারটুকুও নেই। তার প্রয়োজন শুধু পরিশ্রম করার জন্য আর সন্তান উৎপাদনে। তবুও সে বিশ্বাস করে যে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি— এ আমাদের করতেই হবে। জা অমিতা একেবারেই তার বিপ্রতীপ— সংকোচ কুন্ঠাহীন, পরিণত গাম্ভীর্য আর অভিজ্ঞতায় চিহ্নিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্বামী সুকুমারের চাকরী গেলে অমিতা স্কুলের চাকরী নেয়। বংশমর্যাদাকে মূল্য দেওয়া বিমলার এই সংবাদে বিস্ময় উদ্রেকে অমিতা জানায়—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 78 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "...এ তো স্কুলের চাকরী, লজ্জার কি আছে? লেখাপড়া শিখেছি কি পোশাকি কাপড়ের মতো তুলে রাখবার জন্যে, কাজেই যদি না লাগল? ...বংশমর্যাদা নিয়ে গর্ব করার দিন চলে গেছে দিদি। যা দিন আসছে আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের বাঁচতে দেবে নাকি ভেবেছেন?"[১২]

এই অমিতা শিক্ষিতা, রাজনৈতিক বোধের অধিকারী। তাই সে বোঝে প্রতিবাদ করলেই দেশদ্রোহীর তকমা লাগে। বিমলা সাংসারিক জ্ঞান যথেষ্ট থাকলেও বাইরের জগতকে সে দেখতে শেখে অমিতার চোখ দিয়েই। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শুধু কারখানার মালিকই নয় সমাজের অন্যান্যরাও নিজেদের নিয়ন্ত্রণকে কায়েম রাখতে একশ্রেণির মানুষকে দিয়ে দালালরাজ কায়েম করে। অমলাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে বিমলা বুঝতে পারে এই পরিবারের দুই ভাই এবং অমিতার মতো হাজার হাজার মানুষ পুরুষ নারী নির্বিশেষে গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। তার স্বামী যখন নিজেই এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে তাকে নতুন চাকরীর খবর শোনায়, তখন বিমলার এক নতুনতর রূপের সাথে পাঠকের পরিচিতি ঘটে—

> "হঠাৎ আহত বাঘের মতো গর্জন করে উঠল বিমলা, কী বললে? দালালি করবে তুমি? সে টাকা আমি ছোঁব? তুমি না বড়ো ভাই সুকুমারের— দাদা? অমিতা এর জন্যে লড়াই করে জেলে গেল, আর তুমি...? ...বিমলা কাঁদে। বেশ ছিল সে এতদিন চোখ বুজে, কিছু না বুঝে— কেন অমিতা তাকে দুঃখের মধ্যে এমনি করে জাগিয়ে দিয়ে গেল।"[১৩]

এই জাগরণ যে ধীরে ধীরে মেয়েদের পিতৃতান্ত্রিক শৃঙ্খল মোচনের হাতিয়ার হয়ে উঠবে সুলেখা সে বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করতেন। 'বিবর্তন', 'মামনি', 'সংঘাত', 'অভিজ্ঞান' গল্পে রয়েছে এই একই ঘটনার অনুরণন। স্বাধীন ভারতের আশা নিয়ে একদিন যাঁরা লড়াই করেছিল, তাঁরা ভেবেছিল স্বাচ্ছন্দ্য আসবে, সম্মান থাকবে বিদ্যার, পরিশ্রমের, মানুষের পেটে খাবার থাকবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি।

চল্লিশের এর দশকের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নানা ঘটনা স্রোত সুলেখার মেয়েদের মননে চিন্তায় যে পরিবর্তন এনেছিল তাতে তারা অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজে সয়ে সয়ে নিজেকে ক্ষয়ে ফেলায় বিশ্বাসী নয়। বরং সমস্ত নিগড় ভেঙে স্বাবলম্বনে বাঁচতে আগ্রহী। 'শিকার' এর সুধা, রেখা এই মেয়েদেরই প্রতিভূ। গরীব ঘরের মেয়ে সুধাকে ভূপেশ বিয়ে করেছিল একটাই শর্তে যে সে বাপের বাড়িতে রাত কাটাতে পারবে না। ভূপেশ মনে করে অর্থ দিয়ে সব কিছু কিনে নেওয়া যায়, এমন কি মেয়েদের আত্মসম্মানও। প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হবার জন্য সুধার দাদাকে পুলিশে ধরে, মাইনে বাড়াবার দাবীতে বাবার কাজ চলে যায়, প্রচন্ড অর্থা ভাবে ম্যালনিউট্রিশনে ভুগে ছোট ভাইটা মারা যায়। রাস্তায় ছাত্রদের রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলনে গুলি চললে তরুণ ছাত্রের রক্তাক্ত মৃতদেহের সাথে অপুষ্টিতে ভোগা ছোট ভাই সুহাসের মৃত্যু কোথাও একাকার হয়ে যায় সুধার কাছে। বন্ধু রেখার সাথে কথোপকথনে সুধা যখন বলে – "রক্তগুলো যেন সব শুষে নিচ্ছেরে না খেতে দিয়ে, গুলি করে। এত রক্ত দিয়ে ওরা বোধহয় পিতৃপুরুষের আত্মার তর্পন করবে—"[১৪] তখন যেন তার রাগ, যন্ত্রণা আর অসহায়তা একসাথে মিশে ক্রোধের জন্ম দেয়। যে ক্রোধ জন্মজন্মান্তর ধরে গরীব মানুষ অন্তরে পোষণ করে চলে। কারণ তারা প্রতিবাদ করলেই তাদের মরতে হবে, হয় হাতে না হয় ভাতে। রেখার সঙ্গে প্রতিবাদ সভায় গিয়ে সুধা অনুভব করে এই যন্ত্রণা শুধুমাত্র তার একার নয়। সভায় পুলিশের গুলিতে রেখার মৃত্যু হলে সে কিছুটা দিশেহারা হয়ে যায় বটে, তবে তার থেকেই অসামান্য দৃঢ়তায় এক নতুন সুধার জন্ম হয় — "সবার আগে সুধা বাঁচতে চায় মানুষের মর্যাদা নিয়ে।"[১৫] সুলেখা সান্যালের গল্পের মেয়েরা শুধু মেয়েমানুষ নয়, আগে 'মানুষ' তারপর 'মেয়ে'। 'জীবনায়ন' এর সন্তানসম্ভবা সীমাকে অমিতার মতোই স্বামীর চাকরী চলে যাওয়ায় বাইরে কাজ করতে বেরোতে হয়। সংসারে অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে সন্তান আগমনের উচিত-অনুচিত ভাবনাটি একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে সামনে দাঁড়ায়। সীমা বোঝে যে তার এই মাতৃত্বের কোনো অধিকার নেই, যদি ক্ষমতা না থাকে তাকে বাঁচিয়ে রাখার। তার এই সিদ্ধান্তে সহমত হয় তার স্বামী আনন্দও। সীমার শাশুড়ি সুখদা এই অন্যায়কে মানতে না পারলেও শেষে তাদের এই নিরুপায় অবস্থাকে বোঝেন। সংসারের অর্থসমস্যা তাকেও খুব অসহায় করে তোলে। এই অমোচনীয় সমস্যার জন্য তার আক্ষেপের মধ্যে দিয়েই সুলেখা সেই সময়চিত্র বুনে দেন— এই দিন, এই দেশ—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 78 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "কেন এমন হল! আর কত না খেয়ে থাকবে ওরা, কতদিন আর শুকিয়ে থাকবে ওদের জীবন! ...ওরা তো অমন নিষ্ঠুর ছিল না, ছিল না এমন হৃদয়হীন, কে যেন, কী যেন ওদের নিষ্ঠুর করে তুলেছে, ওদের মনগুলো তাই শুকিয়ে যাচ্ছে মুখের সঙ্গে সঙ্গে।"[১৬]

শুধু সময়ের চিত্রণ নয়, কতটা পরিণতমনস্ক এবং সাহসী হলে তবেই চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের একটি মেয়ে এমন একটা সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতে পারে তা দেখানোর সাহস ছিল সুলেখা সান্যালের মধ্যে। অর্থনীতির পরিবর্তনের সূত্রধরে সমাজবিন্যাস শুধু নয়, ব্যক্তিক সম্পর্কের মধ্যেও বিন্যাসের বদল হয়। তারফলে মানুষের ভাবনা জগতেও পরিবর্তন আসে, সময়ান্তরে তার রূপ বদলায়। সুলেখা সান্যালের লেখায় সেই বদলের ইঙ্গিত রয়েছে। 'অভিজ্ঞান' গল্পে স্বাধীনতা- উত্তর মানুষের সমাজে-সংসারে বিপর্যস্ত অবস্থার চিত্রণ। চাকুরীরতা ছোট বোন বিভা বড়ো বোন আভার বাড়িতে বেড়াতে এসে তাদের সংসারের অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়। আভা জানায় তার পরার মতো কোনো আস্ত শাড়ি অবশিষ্ট নেই। এর কারণ আভার স্বামীর কাজের জায়গা থেকে ছাটাই হওয়া জনিত অর্থাভাব। বিভা লক্ষ্য করে নিদারুণ অর্থ কষ্ট আভার চরিত্রের রূপান্তর ঘটিয়েছে। সে স্বামীকে গালাগালি দেয়, অকর্মণ্যতার জন্য দোষারোপ করে, হাত পেতে মানুষের কাছে টাকা চায়। একসময় অসম্ভব আত্মসম্মানের অধিকারী আভার লোভী চোখের দিকে তাকিয়ে বিভা আড়ষ্ট হয়ে যায়, বড় বোন আভার স্বাবলম্বী হতে না পারার জন্য সে নিজেকে অপরাধী ভাবে এই পরিস্থিতিতে। আভার আট বছরের মেয়ে আরতি চায় বিভার কাছে গিয়ে থাকতে। তাকে পড়ার খরচ দিতে চাওয়ায় সে, -

> "সজোরে মাথা নাড়ে, না টাকা পাঠিও না তুমি। মা আবার ইস্কুল ছাড়িয়ে দেবে, সেই টাকা দিয়ে চাল কিনবে।... আমাকে নিয়ে যেও তুমি, আমি লেখাপড়া শিখব, তোমার মতো হব। মা একটুও ভালো না— খিদে লাগলে, খেতে চাইলে কেবল বকে।"[১৭]

সন্তানের চোখে মায়ের মূল্যায়নে অর্থ এবং পেটের ভাত কিভাবে মানদণ্ড হয়ে উঠছে তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা রয়েছে এই গল্পে। 'ফাটল' গল্পে দুই প্রজন্মের দুই নারীর সুখ-দুঃখের দৃষ্টিভঙ্গির তফাত বর্ণনা করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত লেখনিতে। স্বামী পরিত্যক্তা সুমতি দুই সন্তানের মা। তিনি তাঁর দুই ছেলেমেয়েকে যথেষ্ট শিক্ষিত করেছেন। তারা উভয়েই স্বাবলম্বী এবং নিজের মত প্রকাশে সাবলীল। অনেক সময়ই সুমতির আজন্ম লালিত সংস্কারের সাথে তাদের মত মেলে না। মেয়ে স্বামীর ঘর করবে না শুনে সুমতি মেনে নিতে পারে না। সুমতির স্বামী তাকে ছেড়ে গেলেও সে সেই মদ্যপ, লম্পট স্বামীর ছবিতে মালা, ধূপ-দীপ দেন এখনো। কিন্তু তাঁর শিক্ষিতা স্বাবলম্বী মেয়ে তাকে নতুন জীবনবোধে উন্নীত করে—

> "আদর্শ মানতে গিয়ে অসুখী হয়ে কী লাভ মা? ...জীবনে, আনন্দ থাকলে, ভালোবাসা থাকলে সে সুখ ছেড়ে যাবে কেন কেউ অন্য কথা ভাবতে?"[১৮]

এতো একেবারে একবিংশ শতকের উচ্চারণ। কিন্তু সুমতির না মানতে পারাকে মূল্য দিয়ে অরুণা যখন ফিরে যাবে বলে ঠিক করে তখন তিনি বুঝতে পারেন তিনি একটা মিথ্যে আবরণ দিয়ে নিজেকেই বঞ্চিত করেছেন এতদিন। উত্তরিত বোধে ছেলেকে তাই বলেন - "ও কেন ফিরেই গেল। কেন ওকে যেতে দিলি তোরা?"[১৯]

সুলেখার গল্পগুলিতে নারী শুধু মা বা স্ত্রী নয়, প্রেমিকাও বটে। অরুণা, নীলা, সীতা, বিদেশী মেয়ে নীনা, নমিতা, লতা এরা সকলেই নিজেদের মতো করে প্রেমের পথে হেঁটেছে। সে প্রেম কখনো ব্যক্ত, কখনো অনুচ্চারিত, কখনো অপ্রাপ্তির। তিনি যে সময়ে লেখালেখি করছেন মেয়েদের বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেমন কঠিন ছিল, তার থেকেও কঠিন ছিল বিবাহের বিকল্প ভাবনা। 'প্রতীক' গল্পটি তার মৃত্যুর কিছু আগে লেখা। এখানে যে তার নিজের জীবনের সরাসরি প্রতিফলন রয়েছে তা পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। পশ্চিমের কোনো এক হাসপাতালে চিকিৎসারত বাঙালি মেয়ে মীনার সাথে পরিচয় হয় সেই দেশে বসবাসকারী দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত নীনার। সে মীনার দাদা অমলের সহকর্মী। তার সাথে কথা বলতে বলতে মীনা বুঝতে পারে সে অমলকে ভালোবাসে, কিন্তু কখনো তা ব্যক্ত করেনি। কারণ সে জানে অমল বিবাহিত। ব্যক্তিগত জীবনের ভাঙাগড়ায় বিদেশিনীদের সম্পর্কে সুলেখার অন্য লেখা থেকে যে ধারণা করা যায় সেই আর্কেটাইপ থেকে লেখিকা নিজেই নীনাকে বের করে এনেছেন। হয়তো জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি এই বিশ্বাসে স্থিত হতে পেরেছিলেন যে সহমতের ভিত্তিতেই কোনো সম্পর্ক এগিয়ে চলে। সম্পর্কের দায় কখনো একপক্ষীয় হতে পারে না। 'রূপ'

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 78 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গল্পে নীলার রূপহীনতার অজুহাতে স্বল্প রোজগেরে কমলেশ কথা দিয়েও বিয়ে না করে পালিয়ে গিয়েছিল। আজ তার প্রতিপত্তি বাড়ায় সে মনে করে নীলাকে আবার বিবাহ প্রস্তাব দিলেই সে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু নীলাও জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজকে অনেক কিছুই নতুন করে ভাবতে শিখেছে। নীলারা পাকিস্তানে বসবাসকালে তাকে সেতার শেখাত বাবার যে ছাত্র, তার ভালোবাসাকে ফাঁকি দিয়ে নীলাও একদিন পালিয়ে এসেছিল। তার মূলেও ছিল সেই রূপ- "দেখতে কুৎসিত ছিল বলে আপত্তিটা আমারই ছিল, বাবাও রাজি হননি।"[২০] শেষ পর্যন্ত সে কমলেশের বিবাহ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে সেই ছেলেটিকে খুঁজতে চলে যায়, যে তাকে একদিন ভালোবেসেছিল। রূপ যেমন ভালোবাসার থেকে কখনো বড় হতে পারে না, তেমন নিজে ভালোবেসে প্রত্যাখ্যাত হবার চাইতে ভালোবাসা পাওয়ার মূল্য অনেক বেশি, সুলেখার লেখনিতে এই সত্যে স্থিত জীবনাদর্শেরই প্রকাশ।

সুলেখা সান্যাল যে জীবনের ক্যানভাসে ছবি ফুটিয়ে তোলেন তার একটাই রঙ নয়। তিনি ছিলেন জীবনসন্ধানী শিল্পী। জীবনের ছোট ছোট মূহুর্তগুলিকে একসাথে করে একের পর চিত্র এঁকে গিয়েছেন। জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর 'সমস্যা কাদের ও কেন?' প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন—

> "... মানুষের পরিচয়ের সোনার কাঠি মানুষের হাতে নেই। প্রত্যেক আবেষ্টন, মনের তারে প্রতিটি আঘাত, এক-একবারের স্পর্শ তাকে ক্রমাগত নতুন করে তোলে। মেয়েরাও এই মানুষই। সমাজ বিজ্ঞানে, মনোবিজ্ঞানের এখনো এটা জানা বাকি আছে। ...মেয়েদের কথা মেয়েরা জানেন ততটাই, পুরুষ যতটা নিজেকে জানেন। প্রভেদ শুধু ভাবে, প্রকাশের ধরণে।"[২১]

সুলেখার মেয়েরা তাদের পরিচয় মাতৃত্ব, পত্নীত্ব বা প্রণয়িনীর মধ্যে খুঁজতে চায়নি। বরং মানুষের মর্যাদায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে সবসময়। এর মধ্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যকে খুঁজে নেয় পাঠক। নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখা সুলেখা স্বল্প জীবন পরিসরের লেখন-বিশ্বের মাধ্যমে হয়তো সমাজ পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি তবে নারীর অন্তর্বয়নের ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা থাকবে।

Reference:

১. অধিকারী, গৌতম, সুলেখা সান্যাল রচনাসমগ্র, ১ম খন্ড, কথারূপ, ১৯৬৫, পৃ. ৯
২. ঘোষ, শুভঙ্কর, 'সুলেখা সান্যালের কথাসাহিত্য : বয়ানে বয়নে অন্তর্বয়নে', অধিকারী গৌতম (সম্পা), কথারূপ, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০২, পৃ. ৬৩
৩. অধিকারী, গৌতম, সুলেখা সান্যাল রচনাসমগ্র, ১ম খন্ড, কথারূপ, ১৯৬৫, পৃ. ৩৫৫
৪. অধিকারী, গৌতম, সুলেখা সান্যাল রচনাসমগ্র, ২য় খন্ড, কথারূপ, ২০১৩, পৃ. ৩৫৬
৫. তদেব, পৃ. ২৫৭
৬. তদেব, পৃ. ২৩৪
৭. তদেব, পৃ. ২৩৮-৩৯
৮. তদেব, পৃ. ১৯১
৯. তদেব, পৃ. ১৯৭
১০. পন্ডিত, তুষার, 'সুলেখা সান্যালের গল্পের ভুবন', অধিকারী গৌতম (সম্পা), কথারূপ, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০২, পৃ. ১১১
১১. সিমোন দ্য বোভেয়ার, দ্বিতীয় লিঙ্গ, সিংহ কঙ্কর (অনু), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২০৪
১২. অধিকারী, গৌতম, সুলেখা সান্যাল রচনাসমগ্র, ২য় খন্ড, কথারূপ, ২০১৩, পৃ. ২৭৯
১৩. তদেব, পৃ. ২৮১
১৪. তদেব, পৃ. ২৪৯
১৫. তদেব, পৃ. ২৫২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 78 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৬. তদেব, পৃ. ১৬৫
১৭. তদেব, পৃ. ২৬৪
১৮. অধিকারী, গৌতম, সুলেখা সান্যাল রচনাসমগ্র, ১ম খন্ড, কথারূপ, ১৯৬৫, পৃ. ৩৮৩
১৯. তদেব, পৃ. ৩৮৪
২০. তদেব, পৃ. ৩৯২
২১. ঘোষ, গৌরকিশোর (সম্পা) জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন, চতুর্থ খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ১৪৫